তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা : শ্রীঅরবিন্দের পাদপদ্মে দিলীপ

শুক্লা দত্ত

উপনিষদের ঋষি উচ্চারণ করেছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্—আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

অর্থাৎ আমি জানি তমসার পারে আসীন সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষকে। তাঁকে জানলে তবেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারে—অমৃত লাভের অন্য পথ নেই। একদা কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের কাছে গুরুর প্রতি শিষ্যের এই একান্ত গভীর অনুভূতির কথা অকপটে ব্যক্ত হয়েছিল। গুরু তথা মহাপুরুষ হলেন ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং তাঁর চরণাশ্রিত প্রত্যক্ষ শিষ্যটি সাধক দিলীপকুমার রায়। এখানে তাঁদের দু'জনের নিবিড় সম্পর্কের কথাই উচ্চারিত হবে।

বিত্তশালী পিতা কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার রায় ছেলেবেলা থেকে বেড়ে উঠেছিলেন প্রাচুর্যের মধ্যেই। এদেশের পাঠ সমাপ্ত করে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন বিলেত যান উচ্চ শিক্ষার জন্য, দিলীপকুমারও তেমনি বিলেত গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা শেষ করে। দ্বিজেন্দ্রলালের কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জনের সঙ্গে কাব্য-সংগীতের যোগ ছিল না। তবু ইংল্যান্ডে গিয়ে শুধু ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ রচনা নয়, ইউরোপীয় সংগীতচর্চায় অনেকদূর অগ্রসর হন পিতা। পুত্র কেম্ব্রিজে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নের শেষে সংগীতকে জীবনের প্রধান অবলম্বন করলেন। ভাবলে অবাক লাগে, হিসাবশাস্ত্র পাঠেও কৃতী ছাত্রটির একসময় বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক শুধু নয়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংগীতের চর্চায় গভীর জ্ঞানার্জনও করেছিলেন তিনি। পিতার অনুগামী পুত্র সারা য়ুরোপ জুড়ে তাঁর দরাজ কণ্ঠের গানের সুরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন শ্রোতাদের। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সুরকার-গীতিকার পরিচয়।

এ-হেন পরিমণ্ডলে গড়ে-ওঠা দিলীপকুমারের জীবন ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে যায়। ডুব দেন তিনি ভক্তিসাগরে। 'ঈশ্বরদর্শনই মানব জীবনের উদ্দেশ্য'—দিলীপকুমারের এ-বোধ জন্মেছিল ছেলেবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি মুগ্ধতায়। শ্রীঅরবিন্দের সন্ধান প্রথম তাঁকে দেন কৃষ্ণপ্রেম তথা ইংরেজ সাধক রোনাল্ড্ নিক্সন। আলমোড়াবাসী কৃষ্ণপ্রেম প্রথম শোনান শ্রীঅরবিন্দের গীতার কথা। এমন উচ্ছ্বল ও গভীর ব্যাখ্যা দিলীপ আর কখনো পড়েননি। শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি *Essays on Gita, Synthesis of Yoga, Future Poetry, Life Divine* ও *Mother* বইগুলিও দিলীপকুমার পড়ে ফেলেন —স্বদেশি নয়, বিদেশি বন্ধুটির প্রেরণায়। কৃষ্ণপ্রেমের মত পল রিসারও তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের কাছে পৌঁছুতে সাহায্য করেছিলেন। আর একজনের কথা দিলীপ স্মরণ করেছেন এ প্রসঙ্গে —বরদাচরণ মজুমদার। বন্ধুর সহায়তায় মুর্শিদাবাদের লালবাগে গিয়ে এই যোগী, শিক্ষকটির সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তিনি। গম্ভীর, সদয়, আত্মসমাহিত মানুষটি তাঁকে গুরু নির্ধারণে নিশ্চিত

করেছিলেন। বুদ্ধিবাদী-আস্তিক, সত্যনিষ্ঠ, চিন্তাশীল, সৃজনধর্মী দিলীপকুমারের জীবনের এই চমকপ্রদ পরিবর্তন খুব একটা সহজসাধ্য ছিল না।

বরদাচরণকে দিলীপকুমার 'মস্ত যোগী' মনে করতেন। যাঁর কাছে প্রথম তিনি যোগবিভূতির পরিচয় পান। তাঁর মধ্যে দূরদর্শনের (ক্লেয়ারভয়ান্স) শক্তি থাকায় তিনি শ্রীঅরবিন্দকে যোগবলে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। তিনিই দিলীপকে বলেছিলেন, 'আপনি কেন অন্য গুরু করতে যাচ্ছেন? শ্রীঅরবিন্দই আপনার গুরু।'... আরও জানান, 'আপনি ভাগ্যবান্। হিমালয়ের নিচে এতবড় যোগী আর নেই এখন।' শ্রীঅরবিন্দের অলৌকিক দর্শনের বলিষ্ঠ অভিঘাতে বরদাবাবু দিলীপকে তাঁর গুরুর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। দিলীপকুমারও উপলব্ধি করেছিলেন—'...আমাকে আমার প্রার্থিত দেশনা (guidance) দিতেই তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন।' এবং 'সেই আমার প্রথম যোগী শ্রীঅরবিন্দের দিকে ফেরা।'

প্রথমবার শ্রীঅরবিন্দকে চিঠি লিখে দিলীপকুমার দেখা করতে চাইলে তিনি অসম্মত হন। কিছুকাল পরে যোগের নানা প্রশ্ন মনে উদয় হতে সমস্যা-জর্জরিত দিলীপ আবার চিঠি লিখলেন শ্রীঅরবিন্দকে—সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। এবার তিনি জানালেন পণ্ডিচেরি গেলে তিনি দেখা করতে রাজি। পত্রে অনুমতি মেলায় দিলীপকুমার অবশেষে পণ্ডিচেরি যাত্রা করেন।

১৯২৪ সালের ২৫ জানুয়ারির সকাল। বারান্দায় শ্রীঅরবিন্দ একটি কেদারায় আসীন। দিলীপকুমার প্রথম দর্শনের স্মৃতি এভাবেই তুলে ধরেছেন—

> প্রণাম করে বসলাম। ...সৌম্য, প্রশান্ত মূর্তি। এমন স্থির অতলস্পর্শী শান্তির আভা কারুর চোখে ফুটতে দেখিনি কখনো। শ্মশ্রুর প্রাচুর্য নেই, কিন্তু চুল আস্কন্ধ—এলায়িত। গায়ে একটি চাদর শুধু, খালি পা। মনে এমন সম্ভ্রমের ভাব এল। বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে। যোগী! এর আগে মঠের সন্ন্যাসী বড়জোর দু-একজন তান্ত্রিক দেখেছি, কিন্তু নির্জনবিলাসী যোগীতপস্বীর এত কাছে কোনোদিন আসিনি—বিশেষত এমন যোগী যিনি আমার সম্বন্ধে কিছু খবর রাখেন।

দিলীপকুমার ভাবেননি তাঁর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কণিকাপ্রমাণও উৎসাহ আছে—পরে জেনেছিলেন তাঁর সংগীত সন্ধিৎসা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তীকালে এ-সম্বন্ধে দিলীপকুমারকে লেখেন—'...Even before I met you for the first time, I knew of you and felt at once the contact of one with whom I had that relation which declares itself constantly...and followed your career with a close sympathy and interest.'

সেই প্রথম সকালে শ্রীঅরবিন্দ স্থির প্রেক্ষণে দিলীপকুমারের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন। ভাবের ঢেউ লাগলো দিলীপের মনে। বলেছেন, 'তেমন ধারা দৃষ্টি কখনো আমার চোখে পড়েনি আজ অবধি।' প্রথম দর্শনেই চোখে মুগ্ধতা, বুকে লাগে রক্তের দোলা—ঔপনিষদিক বাণী জীবন্ত রূপে প্রতিভাত হলো যোগীরাজকে দেখে। মানসপটে ভেসে উঠল গুরু হিসেবে একজন মানুষেরই মুখ—শ্রীঅরবিন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ জানতে চেয়েছিলেন দিলীপকুমার কেন তাঁর কাছে যোগে দীক্ষাপ্রার্থী। জীবনের লক্ষ্য কী, সংসারের নানা অসঙ্গতি ও স্বতঃবিরোধের দুঃখদৈন্য—আধিব্যাধির কোনো মীমাংসা যোগে মেলে কিনা—এ-সব জিজ্ঞাসা মেলে ধরেন দিলীপকুমার।

পণ্ডিচেরি গেলেন, শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনও ঘটল—তবে দিলীপের প্রত্যাশা পূরণ হল না। আলাপ-আলোচনা শেষে শ্রীঅরবিন্দ জানালেন—'আমি কেবল তাকে আমার যোগে দীক্ষা দিতে পারি যার কাছে এ যোগ ছাড়া অন্য কিছুই করণীয় মনে হয় না। তোমার মধ্যে এমন তৃষ্ণা তো এখনো জাগেনি। তুমি চাও জীবন-সমস্যার খানিকটা সমাধান। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাসা—Seeking-হল আসলে মনের তৃষ্ণা—অন্তরাত্মার নয়।' আমরা জানি, এই জিজ্ঞাসা পরে অন্তরাত্মার জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ শিষ্যের যোগসাধনার ক্রমোন্নতি এবং ঈশ্বরদর্শনের প্রয়াস উপলব্ধি করেছিলেন।

যোগ হলো, মনের রাজ্যে মনের উপরের লোকের কোনো ধ্যানমূর্তিকে আবাহন করা, প্রতিষ্ঠা করা। যোগের ফলে শিল্পীর শিল্পকলার উৎকর্ষ হয়। যোগসাধনাকে দিলীপকুমারের প্রথমদিকে অত্যন্ত নীরস, কঠিন, শুষ্ক, প্রাণহীন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন বলে মনে হতো। সেজন্য কবিতা-গানকে তিনি ছাড়তে পারেননি। গুরুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন সর্বসমক্ষে গান গাওয়ার জন্য। গুরু জানান : '...যোগসাধনার জন্য তোমাকে কবিতা-গান ছাড়তে হবে না, বরং শিল্প যদি সত্যিকার শিল্প হয় তবে সে যে ইন্দ্রিয়লোকেই বহন করে আনে অতীন্দ্রিয়ের আভাস—বাণীতে, যন্ত্রে, ধ্যানে।' সেইসঙ্গে আশ্বস্ত করেন, দিলীপকে নিজস্ব স্বভাব বিসর্জন দিতে হবে না—'...you got the poetic power as soon as you began yoga–the yogic force made the passage clear.'

দীক্ষা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকুমারকে বলেন যে দীক্ষা তখনই পাওয়া যায়, 'যদি যোগের শর্তে তুমি রাজি থাকো এবং তোমার যোগতৃষ্ণা প্রবল হয়' (Provided your call is strong)। যোগের প্রধান শর্ত হল—অন্তরে আসক্তিশূন্য হতে হবে যাকে বলে মোক্ষ, বাইরের বন্ধন না ছাড়তেও হতে পারে—তবে প্রয়োজনে যোগে যা প্রতিকূল তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যোগ হল 'উপলব্ধির ব্যাপার'—জীবন দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি। তাঁর মতে :

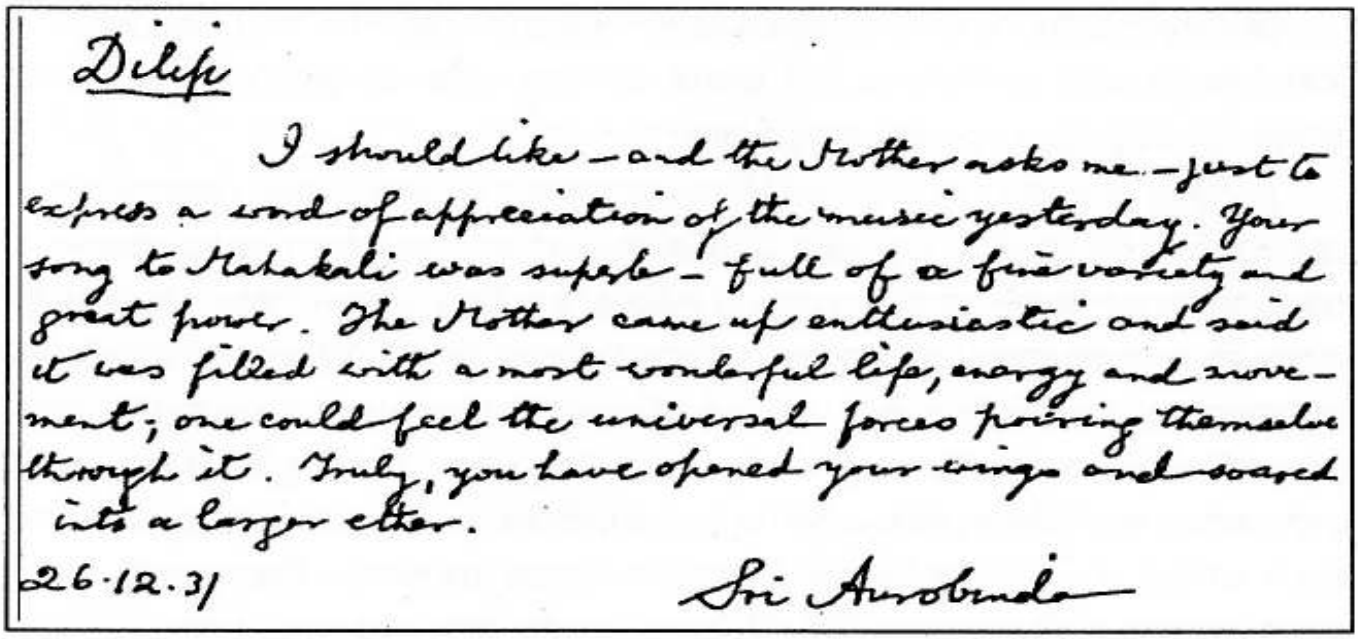

Dilip

I should like – and the Mother asks me – just to express a word of appreciation of the music yesterday. Your song to Mahakali was superb – full of a fine variety and great power. The Mother came up enthusiastic and said it was filled with a most wonderful life, energy and movement; one could feel the universal forces pouring themselves through it. Truly, you have opened your wings and soared into a larger ether.

26.12.31 Sri Aurobindo

দিলীপকুমার রায়কে লেখা শ্রীঅরবিন্দর একটি চিঠি

'যেখানে পার্থিব সুখের শেষ সেখান থেকেই পারমার্থিক আশ্বাসের শুরু।' জ্ঞান ও আনন্দ-লাভ যোগে সম্ভব। যোগ আমাদের চেতনাকে আরো বিস্তীর্ণ করে, গভীর করে, আলোকিত করে। সবশেষে শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে তাঁর যোগসাধনার পথ বড় কঠিন এবং তাতে বিপদও আছে—'তাই আমি কাউকেই এ-যোগ নিতে বলি না, যদি-না তার তৃষ্ণা এত বেশি প্রবল হয় যে,সে এর জন্য তার যা আছে সব কিছু ছাড়তে রাজি থাকে।' স্নিগ্ধ কণ্ঠে দিলীপকে জানালেন : 'তোমার এখনো সময় হয়নি। তোমার মধ্যে যে-তৃষ্ণা জেগেছে সে হ'ল মনের জিজ্ঞাসা—কিন্তু অন্তত আমার যোগে দীক্ষা পেতে হলে এর চেয়ে বেশি কিছু সম্বল চাই। আরো কিছুদিন যাক না।'

দিলীপ দুঃখ পেলেন ঠিকই, কিন্তু একটা স্বস্তি, আনন্দের ভাবও অনুভব করলেন। প্রত্যাখ্যাত হয়ে দীক্ষা না পেয়ে গভীর বৈরাগ্য নিয়ে দিলীপ ফিরলেন যেন অন্য মানুষ। শিল্পী দিলীপকুমারের মধ্যে গুরু-ঋষি-শক্তিতে জেগে উঠল ফের সেই সুপ্ত দুরাশা—যে চেয়েছিল শুধু কৃষ্ণকে—ধন মান যশ কাব্য গান শিল্প কিছুই নয়।

দিলীপকুমারের নবীন বয়সে টাগ অফ ওয়ার করতে গিয়ে রাপচার হয়। তলপেটের ডানদিকে ব্যথা, হার্নিয়াও ছিল। যোগবলে শ্রীঅরবিন্দ সে-কথা জানতে পেরে চেয়েছিলেন দিলীপ অপারেশন করিয়ে তারপর তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে আসুক, শিষ্যত্ব গ্রহণ করুক। তাছাড়া স্মৃতিকথায় বলেছেন—'দিলীপ আমাকে লিখেছিল ওর হার্নিয়ার কথা। আমি ওকে লিখেছিলাম অপারেশন করাতে। অপারেশনের পরেই ওকে ডেকে নেব।' সম্ভবত দিব্যদৃষ্টিতে প্রথম দর্শনেই দিলীপকুমারের সত্যপরিচয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন গুরুবাদের বিরোধী। ১৯৩৬ সালের সূচনায় শিষ্য দিলীপকে লেখেন —'I had the same violent objection to Gurugiri, but you see I was oblized by the irony of things or rather by the inexorable truth to become a guru and preach the Guruvada. Such is Fate.'

দিলীপকুমার দীর্ঘ অন্বেষণ ও অপেক্ষার পর শ্রীঅরবিন্দকেই গুরু বলে গ্রহণ করেন—দিলীপ বলেন আমি কোনোরকম শর্ত ছাড়াই আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছি, আপনি আমার সব কিছু নিয়ে আমাকে গ্রহণ করুন।

প্রথমবার পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে দিলীপকুমারের মনে আতঙ্কের ডমরু বেজেছে, সংশয় জেগেছে তিনি কি আশ্রমের গুরুগম্ভীর হাস্যহীন আবহাওয়ায় যোগসাধনা করতে পারবেন—জগত-সংসারের আনন্দ-বেদনা ছেড়ে—! পণ্ডিচেরির নীরস জীবনে ফিরে যাবেন, নাকি যাবেন না—অনেক ভেবেছেন। আরও ভেবেছেন, আমার কি এই-ই স্বধর্ম?—'কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্তঃ' মন্ত্র জপতে জপতে সংসারে হাসি-অশ্রু, আনন্দ-বেদনার অপরূপ দ্বৈতরাজ্য ছেড়ে "নিস্তরঙ্গ একরস অদ্বৈত মঠে আশ্রয় নেওয়া? মনে পড়ত আমার কুষ্ঠির কথা—সন্ন্যাসী হওয়া আমার ললাটলিখন। কিন্তু একদিকে গৈরিকধারী হব ভাবতে আনন্দ, অন্যদিকে সংসার ছাড়ব ভাবতে ত্রাস—এ-দুই বিরোধী মনোবৃত্তির টানাছেঁড়ায় আমার মীরার একটি গানের অবস্থা হল প্রায় ঃ 'দিবস ন ভূখ নীদ নহি রৈন'—অর্থাৎ দিনে নেই ক্ষুধা রাতে নেই নিদ্রা। এককথায় আমি উঠলাম অতিষ্ঠ হয়ে।" কিন্তু এও বলেছেন যে শ্রীঅরবিন্দের দীপ্ত ব্যক্তিরূপ

'আমার মন টানে'। মনে বেজেছে রবিঠাকুরের গানের কলি, 'জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই/ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।'

১৯২৮ সালের ২২ নভেম্বর। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গুরুদেবের চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় নিলেন দিলীপকুমার রায়। ১৯২৬ থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘরের বাইরে যাননি, ছিলেন গৃহবন্দী সাধক। নিভৃতবাসী এই দীপ্যমান মানুষটি সম্পর্কে দিলীপ জানাচ্ছেন যে, মহামানব, শক্তি ও জ্ঞানের মূর্ত প্রতিভূ আমার সঙ্গে আলাপ করছেন, তর্ক করছেন, হাসছেন, ভাব বিনিময় করছেন যেন সমানে সমানে—বিশ্বস্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সজাগ সংহত হয়ে নিভৃত কক্ষে জীবন কাটানোর নিয়ম পালন করেছেন। পার্থিব প্রকৃতির নানা বাধা পেরিয়ে—। দিলীপের মনে শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়—'নীরন্ধ্র অন্ধকারের পরেই ভাগবত জয়সিদ্ধির আলোক তার পথ চেয়ে থাকে যে হতে পারে ভাগবত বাহন।'

পণ্ডিচেরি আশ্রমে প্রথমদিকে দিলীপকুমারের বেশ আড়ষ্টতা ছিল। যোগদানের পর বছরে তিনবার, পরে বছরে চারবার ভক্তরা শ্রীঅরবিন্দকে দর্শন করতেন। তিন-চারশো থেকে পরবর্তীকালে হাজার বারোশো দর্শনার্থী পরপর এক মিনিট গুরুর সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে মনে মনে প্রণাম করে সরে যেত। যোগীন্দ্র গুরুগম্ভীর মুখে নিষ্পলক নেত্রে চেয়ে থাকতেন।

'সে-যুগে পণ্ডিচেরি আশ্রমের অধিকাংশ মনীষীই হাসি-ঠাট্টাকে Vital (উচ্ছল) ব'লে চলতেন সাধ্যম'ত তার ছোঁয়াচ কাটিয়ে।' দিলীপকুমার তাঁর *স্মৃতিচারণে* বলেছেন, '...সাক্ষাৎ যোগিরাজ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা শুরু করলাম...'। গুরুদেবের পরোক্ষ স্নেহ-সাহচর্য পেলেও বিশেষ ক'টি দিন ছাড়া তাঁর দেখা পেতেন না—সাধনায় বিঘ্ন ঘটবে বলে। সাক্ষাতে কথা বলতে না পারলেও যাবতীয় অন্তরাকুতি-জিজ্ঞাসার আশ্রয় ছিল চিঠি। প্রয়োজনে দিনে তিনবারও চিঠি লিখেছেন বিচিত্র বিষয়ে—আশ্রমিক সমস্যা, বৈষয়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, গান, পূর্ণযোগ। আশ্চর্যের কথা, প্রত্যেক চিঠির উত্তরও লিখে পাঠাতেন শ্রীঅরবিন্দ। *Sri Aurobindo to Dilip* শুধু নয়, *Letters of Sri Aurobindo* গ্রন্থে সর্বাধিক পত্রসংখ্যা দিলীপকে লেখা। লিপিকার দিলীপও কয়েক হাজার চিঠি লেখেন গুরু শ্রীঅরবিন্দকে।

দিলীপকুমার-শ্রীঅরবিন্দের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা কতদূর পৌঁছেছিল চিঠিগুলিই তার প্রমাণ। একটি চিঠিতে দিলীপ লিখছেন—'গুরুদেব, দর্শনের সময়ে আপনার অমন মেঘগম্ভীর মুখ দেখে আমার সময়ে সময়ে মনে এমন গুমট হয় যে প্রায় দমবন্ধ হবার উপক্রম। তাই কাতর অনুরোধ : 'আপনি যদি বেচারি দিলীপের অকাল মৃত্যু ঘটাতে না চান, তবে পরের বার দর্শনের সময় যখন আমি ভয়ে ভয়ে আপনার সামনে দাঁড়াব—তখন একটু হাসবেন লক্ষ্মীটি!' এরপর শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দেওয়ার সময় অনুরোধ রক্ষা করে হেসেছিলেন, কিন্তু দিলীপের সংশয় ঘোচেনি। ছড়ায় লিখলেন—

> জানি আমি হায়—দিলীপ 'মানস' রাজ্যেরই প্রজা, পোড়া কপাল!
> তাই মানি গুরু—জানে না সে আজো ভবদীয় 'অতিমানস' কথা।
> কিন্তু, যে তার শৈশব হ'তে এসেছে হেসেই চিরটাকাল,
> চিনিতে সে হারে 'হাসি' বলে কারে? এ-জুলুমে মনে উপজে ব্যথা।

উত্তরে স্নেহের প্রশ্রয়ে শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন—'I did smile at you, though it was not the radiant smile of a Tagore or the child-like smile of a Gandhi.' তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আর একটি কাতর লিপি দিলীপ পাঠালেন—

গুরুদেব!
শুনি তুমি দীনদয়াল, আমার তাই এ-মিনতি চরণতলে,
আজ হ'তে হাসি হাসিও এমন—হাসি বলে যাকে চিনিতে পারি
নহিলে হয়ত তব গম্ভীর দর্শনে—ভয়ে নয়নজলে
কোথা যাব ভেসে! তখন কে পার করিবে অপারে হে কাণ্ডারী!

এভাবেই একদিকে স্নেহ-প্রশ্রয়ে, অপরদিকে ভক্তি-অনুরাগে চলতো গুরু-শিষ্যের ভাব- বিনিময়, চিঠির পারস্পরিক আদানপ্রদানে। ঠিক যেন সন্তানের প্রতি পিতার অকৃত্রিম বাৎসল্য—।

পণ্ডিচেরি আশ্রমে বাসকালে দিলীপকুমারের নানা আবদার-অনুরোধ শ্রীঅরবিন্দ রাখতেন। স্নেহাস্পদকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করতেন তাকে সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য দিতে। আর পাঁচজন সাধকের মত কঠোর নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন করতে হতো না দিলীপকে। তবু সাধনায় মন নেই—লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা নিয়ে জীবনে ছুটে চলেছেন। কণ্ঠে কান্তকবির গান —'...তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এসো মোর মত্ত বাসনা ঘুচায়ে...'। বৈরাগ্য বেদনায় সে-সময় লিখছেন—'যদি দিন না দেবে—তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও?/যদি নাথ, আশা না রবে—মিছে বোঝা কেন বওয়াও।' আমরা জানি এ-গানের ছন্দ-ভাব অনুসরণে অতুলপ্রসাদ লেখেন —'কত গান তো হ'ল গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও...'। একসময় শ্রীঅরবিন্দকে দিলীপ-কুমার বলেছিলেন জীবনে গান ছাড়া অন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু ক্রমশ সেই গানও 'অতৃপ্তিকর' হয়ে উঠেছে। বছরখানেক আশ্রমবাসের পর ১৯২৯ সালে শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকে লেখেন : 'It is not by your mind that you can hope to understand the Divine and its action, but by the growth of the true and Divine consciousness within you.'

কলকাতা ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বহু ভাষাবিৎ, সাহিত্যের নানা ধারায় সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত, গীতিকার-সুরকার-গায়করূপে পরিচিত দিলীপকুমারের জীবনের সংগঠন-পর্ব তথা সাধন জীবনের প্রথম পর্ব ১৯২৮-৩৫। মাত্র উনত্রিশ-ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। ইউরোপে থাকাকালীন *ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা*, প্রধান উপন্যাসগুলি—*মনের পরশ, দু'ধারা, রঙের পরশ, দোলা, বহুবল্লভ, স্বপ্নভঙ্গ* এ-সময়েই লেখা। কবিতার বই *অনামী*। তবে দিলীপের গায়ক পরিচয়ই বেশি প্রচারিত।

১৯৩৫-৪৫ দিলীপকুমারের সাধন-জীবনের মধ্যপর্ব—শ্রেষ্ঠ সময় বা সমুন্নতির কাল। ১৯৩৬ সাল তাঁর সাহিত্যজীবনে পণ্ডিচেরি-পর্ব। প্রকাশ পায় শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ *সূর্যমুখী*, জনপ্রিয় গ্রন্থ *তীর্থঙ্কর*। গুরুর কাছে শিক্ষানবিশি চলছে—তবে ভাবজীবনে বড় পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। কবি এবং সাধক দিলীপকুমারে বিরোধ নেই—তবে কঠিন পথের মধ্যে দিয়ে তাঁকে এগোতে হয়েছে। খ্যাতির শীর্ষে থাকা দিলীপকেও মাঝে মধ্যে সাময়িক হতাশা, নৈরাশ্য ঘিরে ধরেছে।

১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাস। নিজের জন্মদিনের অল্প আগে সংশয়াচ্ছন্ন দিলীপকুমার গুরুদেবকে লেখেন, "যদিও অনেক চেষ্টা করলুম, তবু কোনোভাবে মনঃসংযোগ করতে পারছি না। ...আমি যথেষ্ট পরিমাণে জপ ইত্যাদি করছি, কিন্তু আমার অস্থিরতা কাটছে না। নিঃসঙ্গতার পুরনো ধারণা এবং যথাবিধি সাধনার ইচ্ছাও আমার মধ্যে কাজ করছে। কিন্তু কেমন করে কী করব আমি জানি না। আমি আবার বিষণ্ণতা ও নিঃসঙ্গতার সূচনা যেন অনুভব করছি। আমার জন্মদিনের ঠিক আগে এই ধরনের নৈরাশ্যভাব আমাকে একটু ভীত করে তুলেছে।" শিষ্যের মানসিক সংকট ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে শ্রীঅরবিন্দ চিঠিতে লেখেন—'...So be a good cheerful worker and offer your *bhakti* to the Divine in all ways you can but rely on him to work out things in you.' এভাবেই গুরু শিষ্যকে হতাশার আঁধার থেকে দিব্যজগতের আলোয় আলোকিত হবার পথ দেখিয়েছেন। দিলীপকে সাময়িক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, হতাশা-নৈরাশ্য থেকে উদ্ধারের জন্য শ্রীঅরবিন্দ নানাভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। যুক্তিবাদের নিরর্থকতা ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'Logic, after all, is only a measured dance of the mind, nothing else.' বুঝিয়েছেন সাধক ও পর্যবেক্ষকের তফাৎ।

দিলীপকুমার রায় বুদ্ধিবাদী আস্তিক ছিলেন। ভক্তিসাধনার পথেও যেন কিছুদূর পর্যন্ত যুক্তি বা বুদ্ধিকে আশ্রয় করে এগোতে চেয়েছেন। ফলে সংশয় বুদ্ধি মাঝে মধ্যেই তাঁকে গ্রাস করেছে। শ্রীঅরবিন্দকে সর্বস্ব সমর্পণ করেও তাঁর দ্বিধা কাটে না। আসলে তিনি ছিলেন 'Somewhat of a sceptic-realist.' শ্রীঅরবিন্দ শুধু শিষ্যের দ্বিধা-সংশয় দূর করেননি, শিষ্যকে গ্রহণ করেছিলেন 'একজন বন্ধু, একজন সন্তান' হিসেবে। তাঁর অভাব-অভিযোগ, রাগ-অভিমানকে কমিয়েছেন ভালোবাসা দিয়ে। যথার্থ গুরু হিসেবে তাঁকে সাধনার পথও দেখিয়েছেন। নিজের যোগশক্তি দান করে শিষ্যের মধ্যে 'চৈত্যপুরুষে'র জাগরণ ঘটিয়েছেন।

দিলীপকুমার একসময় গুরুকে বলেন,—'বাইরের পাঁচজনে অনেকেই দেখি ঠাউরে বসে আছেন যে, আমি আনন্দ বিশ্বাস বলিষ্ঠতার একটি দীপ্ত বিগ্রহ—যেখানে আসলে আমি হচ্ছি বিষণ্ণ, দুর্বল ও একলা।' শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যুত্তরে জানান—'তারা তোমার ভিতরের মানুষটার দেখা পেয়ে বলে একথা। তার মধ্যে ঐসব গুণ বিদ্যমান রয়েছে যে। তোমার বাইরের মানুষটাই পড়েছে গোলমালে কেন না সেই এনেছে আড়াল যার বলে তোমার নিজের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না তোমার সেই অন্তর্লোকের স্বরূপকে।' আরও প্রশংসা করেন, 'তোমার নিজের বুদ্ধির রায়ে তুমি আস্থা রাখতে পারো স্বচ্ছন্দে'।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি কখনই চাইতেন না তাঁর অনুগামীদের তাঁরই ছাঁচে গড়ে উঠতে হবে। তাঁর অনুবর্তী হোক বা তাঁর যোগ করুক সকলে —এমন প্রত্যাশাও ছিল না তাঁর মনে।

দিলীপকে জানান, 'আমার নিজের মত যদি শুনতে চাও তবে বলব যে আমি বৈরাগ্যের খুব পক্ষপাতী নই—যে কথা তুমি জানো। আমি বরাবরই গীতার 'সমতা'র অনুমোদন করে এসেছি—অর্থাৎ অনাসক্তি।' 'He does works for the sake of the Divine only, as a pure sacrifice, without attachement or desire.'

যোগের পরম লক্ষ্য ভাগবত উপলব্ধি এবং জীবনে তার সুপ্রকাশ। ভাগবত সাধক শুধুমাত্র ভগবানের জন্যে যা কিছু করবে—উদ্বুদ্ধ হবে যজ্ঞ বা নিবেদনের ভাবে, কোনো আসক্তি বা

বাসনাকে আমল দেবে না। শ্রীঅরবিন্দ একাধিকবার লেখেন যে তাঁর বৈরাগ্য প্রবণতার মূলে ছিল তাঁর জন্মান্তরের সংস্কার। বৈরাগ্য নয়, তিনি অনাসক্তির পক্ষপাতী। 'বৈরাগ্য আমার ক্ষেত্রে প্রবল না হ'লে আমি কিছুতেই আমার আসক্তির মায়া কাটাতে পারতাম না।'

যোগসাধনার দুটি পথের কথা বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ—সনাতন তপস্যার পথ এবং গুরুবাদ অর্থাৎ গুরুকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে বরণ করা।

দিলীপকুমার রায় ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। ফলে নানা অঘটন ও যোগবিভূতি অবিশ্বাস করতেন। *Letters of Sri Aurobindo* থেকে জানা যায় তিনি গুরুদেবকে এ-নিয়ে জেরা করতেও ছাড়েননি। শ্রীঅরবিন্দ জানান যে তাঁকেও একসময় 'দুর্জ্ঞেয় নাস্তিকতা'র (agnostic denial) মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। সংশয় আর অবিশ্বাসের পথ ধরে সত্যের লক্ষ্যে পৌঁছুনোতে তিনি বিশ্বাসী নন। অলৌকিক যোগবিভূতিকে শ্রীঅরবিন্দের সর্বদাই 'একান্ত স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য' মনে হয়েছে। মানুষের বাহ্য চেতনাই শক্তির শেষ কথা নয়। মানবিক চেতনার ঊর্ধ্বতর ব্যাপ্তি ও বিকাশ আছে। বড় কবির কাব্য রচনা বা সুরকারের সুরসৃষ্টির ক্ষমতাকে যেমন বিশ্বাস করা চলে, তেমনি নানা যৌগিক ও তান্ত্রিক শক্তিকেও বিশ্বাস করা চলে। লক্ষের মধ্যে একজন মানুষের মধ্যে এ-অঘটনী প্রতিভা থাকে। যোগ-বিভূতির শিখরসিদ্ধিতে শ্রীঅরবিন্দ পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর মতে অঘটন বা যোগ-বিভূতি গুজব বা ভেল্কিবাজি নয়।

ভৌতিক আবির্ভাব বা নেপথ্যশক্তির রীতিনীতি নিয়ে সন্দিহান দিলীপকে শ্রীঅরবিন্দ জানান : 'এসব তথাকথিত অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে লৌকিক বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি যে-সব রায় দেয় সে-সব প্রায়ই ভ্রান্ত—কেননা এসব শক্তিদের ক্রিয়া সত্যভিত্তিই বটে, সবটাই জাল-জালিয়াতিই নয়।' তবে এই উত্তরে অবশ্য দিলীপকুমারের সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়নি। শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করতেন, বৈরাগ্য দিলীপের স্বভাবের মধ্যে শেকড় গেড়েছে—তাই মাঝে মধ্যে কবিতা-গানও তার মনকে তৃপ্তি দিচ্ছে না। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দিলীপ লেখেন—'আমি লিখতে বসতে-না বসতে আসে নতুন নতুন কবিতা। গান গাইতে শুরু করতে না করতে আসে নতুন সুর—চেষ্টা করতে হয় না।' জবাবে গুরু শিষ্যকে জানান, —'ঐ হ'ল তোমার চৈত্যপুরুষের কাজ—যে তোমার কবিতা বা গানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে জানান দেয়।'

পণ্ডিচেরি বাসকালে দিলীপকুমার আশ্রমবাসীদের কাছে শ্রীঅরবিন্দের লেখা কয়েকটি চিঠি পেয়েছিলেন। ১৯২২ সালের ১৮ নভেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে লিখিত একটি চিঠি তাঁকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। 'যোগশক্তির ফলে একটা নব চেতনা মেলে'—চিঠিতে গুরুর এই মন্তব্যে শিষ্যের জিজ্ঞাসা জাগে, 'এ-চেতনার কি কোনো প্রত্যক্ষ ফল ফলে?' অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি, বিশ্বাস, অন্তরের অন্তর্দৃষ্টির ফলে যোগে বিশ্বাস আসে। সেই গভীরে বুদ্ধির আলোয় যে দেখতে শেখায় দৃশ্যমানের যবনিকার পিছনে যা যা ঘটছে। মুক্ত যোগীদের শক্তি মানুষের ইষ্ট করে। কারণ তাদের অহঙ্কার নেই, বাসনা নেই—তার সকল কাজের প্রেরণা আসে ভাগবত চেতনা থেকে, মানুষী চেতনা থেকে নয়।

শ্রীঅরবিন্দের *Synthesis of Yoga*-র একটি কথা দিলীপকুমারের অ-প্রতিপাদ্য মনে হয়েছিল। প্রতি মানুষকেই খুঁজে বার করতে হবে তার জীবনের পূর্ণযোগকে। একজনের

বিকাশের চরিতার্থতা যে-পথে, সে-পথ শুধু তারই—আর কারুর নয়। 'সব মানুষের অন্তিম লক্ষ্য এক হ'লেও প্রতি মানুষকেই সে-লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে তার নিজের পথে, নিজের পায়ে, নিজের ছন্দে'—গুরুদেবের এ-কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন অনুগত শিষ্যটি।

মহৎ কাব্য বা সংগীতের জন্ম আমাদের গহন অন্তর্লোকে—সেখানের সঙ্গে যোগস্থাপন প্রয়োজন। যোগে দীক্ষা পাওয়ার পর দিলীপের মধ্যে কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়েছিল—অন্তর্লোকের সঙ্গে তাঁর বাইরের চেতনার যোগ ঘটেছিল বলে।

দিলীপকুমার কবিতা, গান, উপন্যাস লিখে প্রতিদিন মতামতের প্রত্যাশায় শ্রীঅরবিন্দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন—ব্যাকুল প্রতীক্ষা করতেন গুরুর প্রশংসা বাক্যের জন্য। গুরু শিষ্যকে শুধু পূর্ণযোগে দীক্ষা নয়—কবিতাও লিখতে শেখান। কদাচিৎ সংশোধন-পরিবর্তন-পরিমার্জন করলেও রচনাগুলি পড়ে প্রশংসাই করতেন বেশি। 'তোমার চারটি সনেট ভারি সুন্দর হয়েছে—তোমার সনেটগুলি সবসময়েই রূপে বর্ণে ভাবে অনুপম। এগুলি পড়ে পরম আনন্দ পেয়েছি।'

দিলীপের কবিতা দিব্যদর্শনের উপযোগী, সেখানে রসোপলব্ধি এবং সত্যোপলব্ধি ভাষারূপে প্রকাশ পেয়েছে বলেই তাঁর কবিতা শ্রীঅরবিন্দের প্রশংসাধন্য। তিনি বলেন : তোমার কাব্যের বিশেষ মূল্য এইখানে যে যখন তুমি লেখ তখন তোমাকে প্রেরণা দেন তোমার চৈত্যপুরুষ (psychic being) : এই জন্যেই, যাঁরা জীবনে অন্তর্মুখী—যাঁরা পেয়েছেন কিছু আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ—তাঁরা তোমার কবিতায় এত গভীরভাবে সাড়া দেন।'

১৯৩৭ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করে দিলীপকুমারকে লেখেন—'...সরস্বতী যখন তোমার কণ্ঠে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছেন, তখন নব-জাগ্রত ভাষায়, তোমার যা কিছু বলবার নিজের জবানিতেই বলে যেয়ো। তোমার বলবার কথাও ত' জমে উঠেছে তোমার ভিতরের থেকে।'

দিলীপের উপলব্ধিও তাঁর *স্মৃতিচারণ*-এ ধরা পড়েছে—'শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎবাণী আমার কাছে শুধু অবিস্মরণীয় নয়—আশ্চর্যও বটে, কারণ যখন আমি প্রথম *অনামী* (১৯৩০) প্রকাশ করি তখন আমি সত্যিই জানতাম না যে যোগশক্তির বলে কবিত্বশক্তিরও স্ফূরণ হওয়া সম্ভব।' শুধু পূর্ণযোগ নয়, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি নানা বিষয়ে দিলীপকুমার শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। 'Art for Art's sake' ধারণার পরিবর্তন ঘটে গুরুর সংস্পর্শে এসে। শিল্প-সাহিত্যচর্চা তখনই সার্থকতা পায়, যখন তার সঙ্গে বোধি ও উপলব্ধির মেলবন্ধন ঘটে। অর্থাৎ 'Art for Divine's sake'-এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হল।

শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন দিলীপকুমারের রক্ষাকবচ। শিষ্যের অবিশ্বাসী মনকে প্রায় হাত ধরে বিশ্বাস ও সত্যসন্ধানের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন গুরু। দিলীপ অন্তরের ভিতর-বাহিরের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন গুরুকৃপায়। তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে পত্রাবলীর পাতায় পাতায়।

গুরু-শিষ্যের সর্বদা মতে মিল হতো না ঠিকই। তবে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে শ্রীঅরবিন্দকে দিলীপকুমার অকৃত্রিম ভক্তিশ্রদ্ধা করে এসেছেন, তাঁর নানা চিন্তা তথা নির্দেশ থেকে কত পথের পাথেয় পেয়েছিলেন, তাঁর দৃষ্টান্তে ও স্নেহাশীর্বাদে কত শক্তি পেয়েছেন। *স্মৃতিচারণ*-এ জানিয়েছেন, 'একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে, সব গুরুবাক্যকেই আমি সবসময় মেনে নিতে পেরেছি। এ-ও আমার কোনোদিনই মনে হয়নি যে, শিষ্য গুরুর মতামতে কখনো

কদাচিৎ সায় দিতে না-পারার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে করজোড়ে গুরুর স্তাবকতা না করলে নরকে যাবেই যাবে। তবে আমার এ-ধরনের মতামত শুনে শিউরে উঠে আমার অনেক গুরুভাইই আমাকে উন্মার্গগামী মনে করার দরুন বহু মনঃকষ্ট পেয়ে শেষে ১৯৪৩ সালে আর থাকতে না পেরে একরকম জোর করেই গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করি ও খুলে বলতে বাধ্য হই যে, তাঁর সব মতামতেই আমি নির্বিচারে সায় দিতে অক্ষম—এজন্যে তিনি আমাকে বরখাস্ত করলে আমি প্রস্থান করব, কিন্তু আমার বিবেকবুদ্ধিকে ত্যাগ করে তাঁর আশ্রয়ে থাকতে পারব না।'

শ্রীঅরবিন্দ আশ্বস্ত করে বলেন : 'I have never cared to be a dictator, neither do I insist that everybody's views must be moulded by mine, any more than I insist that everybody should follow me or my Yoga.' (*Among the Great*) অর্থাৎ 'আমি যখন কিছু বলি বা লিখি তখন শুধু আমার মতের বা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করি—এমন কথা বলি না যে আমি যা-ই বলব আর সবাইকে মেনে নিতে হবেই হবে।... আমি কোনোদিনই হুকুমী হাকিম হতে চাইনি, বা জোরজুলুম করিনি যে সবাইকার মতই আমার মতের ছাঁচে ঢালাই করতে হবে, কি সবাইকেই আমার যোগ করতে হবে।'

ছাব্বিশ বছরের পরিচয় জীবনে প্রত্যক্ষ কথোপকথন নয়, অধিকাংশ সময়সীমা ঘিরে রয়েছে পরোক্ষ ভাব বিনিময়-পত্রালাপে। শ্রীঅরবিন্দের মতো মহামানবের প্রতি দিলীপ-কুমারের পরম নির্ভরতা ক্রমশ তাঁকে ভক্ত-শিষ্যে পরিণত করেছে। দু'জনের সম্পর্কের মেলবন্ধন ঘটেছে গভীর প্রত্যয়ে। নিশিকান্তর গান কণ্ঠে নিয়েছেন দিলীপ আত্মনিবেদনে একাত্ম হয়ে, একান্ত করে—

> তুমি ছাড়া আর কাহারো কণ্ঠে ধ্বনিয়া ওঠে না অভয় উক্তি।
> তুমি ছাড়া আর কেহ তো আনে না তৃষিতের প্রাণে প্লাবনমুক্তি।

শ্রীঅরবিন্দের মর্ত্যে আগমনের কারণ যেন তপস্যার দ্বারা অতিমানস শক্তির অবতরণ। "এ হেন যুগপ্রবর্তকের কথায় আমি সংশয় প্রকাশ করেছি, তাঁর বাণী সম্ভব কিনা প্রশ্ন করেছি, তাঁর সঙ্গে গল্পালাপ তর্কাতর্কি করেছি এই অধিকারে যে আমাকে তিনি সম্বোধন করেছিলেন তাঁর চিঠিতে 'a friend and a son' বলে!"—

এরপর বোধকরি আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না—শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর প্রায় আড়াই দশকের কনিষ্ঠ সন্তানসম সুহৃদ দিলীপকুমার রায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সম্পৃক্তি নিবিড়তার কথা—গুরুর প্রতি শিষ্যের নির্ভর আত্মনিবেদনের আকুতি।

শ্রীঅরবিন্দের তিরোধান-সংবাদ দিলীপকুমারের কাছে বড় আকস্মিক মনে হয়েছিল। ১৯৫০ সালের ৬ ডিসেম্বর। আশ্রমের প্রয়োজনে অর্থ-সংগ্রহের জন্য বারাণসীতে একটি কন্সার্টের আয়োজনকালে দিলীপ শিষ্যশিষ্যাদের নিয়ে যখন রিহার্সাল দিচ্ছেন, 'সেইসময়ে হঠাৎ রেডিওতে খবর এল শ্রীঅরবিন্দ মহাপ্রয়াণ করেছেন।' ১৯২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যে সম্পর্কের শুরু, ১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর তার পার্থিব যোগ ছিন্ন হল।

১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দের প্রয়াণের পর দিলীপকুমারের জীবনে নেমে আসে অপার শূন্যতা ও হতাশাবোধ। পণ্ডিচেরি আশ্রমে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে আসেন ঠিকই, তবে তাঁর অনুভূতিকে ব্যক্ত করেন এভাবে—'আশ্রমে ফিরে মনে হল সব শূন্য। গুরুদেব

নেই যেখানে, সেখানে থাকতে আর মন চাইল না, কারণ আমি শুধু তাঁরই ডাকে পণ্ডিচেরি গিয়েছিলাম।' ঋষিহীন আশ্রমে বাস করা দিলীপের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠল। তবে পণ্ডিচেরি আশ্রম তিনি তখনই ত্যাগ করেননি। আশ্রম-মাতা মীরা আলফাসা আগের মতোই দিলীপ ও ইন্দিরার প্রতি স্নেহ-বাৎসল্য প্রদর্শন করেন। আমাদের মনে পড়বে ১৯৩২ সালে ১৬ মে তারিখে দিলীপকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের চিঠির কথা—"You do not belong to yourself–you belong to the Divine and myself and the Mother. I have cherished you like a friend and a son and poured on you my force to develop your powers–to make an equal development in the yoga." সেই সঙ্গে দিলীপকুমারের শিষ্যা ও সাধনসঙ্গিনী হিসেবে জনককুমারীকে গ্রহণ করার সম্মতি জানান গুরুদেব (শ্রীঅরবিন্দ জনক-কুমারীর নতুন নাম দেন 'ইন্দিরা দেবী')।

শ্রীঅরবিন্দের অবর্তমানে দিলীপকুমারের অস্থিরতা ও চিত্তচাঞ্চল্য কীরকম বেড়ে ওঠে তা বোঝা যায়। দিলীপ আশ্রমের চার দেওয়ালের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠেন। মাঝে মাঝে মানসিক অবসাদে তিনি ভেঙে পড়েন। আশ্রম-মাতা তাঁকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেন—

"You must not be depressed or sad. You know that Sri Aurobindo has not left us and that he will be here to-morrow as usual." (20.02.1951)। আসলে মাদার দিলীপের অস্থিরতা উপলব্ধি করেন, তবে সর্বদা চান দিলীপ যেন কখনও আশ্রম ছেড়ে না যান।

তবু পণ্ডিচেরিতে মন বসতে চায় না দিলীপকুমারের। তিনি স্থির করলেন, 'খুব দূরে কোথাও যাব, —যতদূর হয় ততই ভালো।' এমন সময় মুক্তি এল মার্কিন দেশ সানফ্রানসিস্‌কো সফরের আমন্ত্রণে—ভারত সরকারের উদ্যোগে। ১৯৫৩ সালের ৩ জানুয়ারি দিলীপকুমার পথে বেরিয়ে পড়লেন আশ্রম ছেড়ে। ১৯২৮ সালের ২২ নভেম্বর থেকে ১৯৫২ সালের ২ ডিসেম্বর—দীর্ঘ চব্বিশ বছরের আশ্রম-জীবন এভাবেই শেষ হলো।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনশক্তি তাঁর প্রিয়তম শিষ্যের মধ্য দিয়ে কাজ করে গেছে। গুরুর প্রয়াণের পরেও গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ব্যাহত হয়নি। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা পণ্ডিচেরিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—দিলীপকুমারের উত্তরজীবনে তা সম্প্রসারিত হয়েছে পূর্ণযোগের সাধনায়।